দৈনিক
ইত্তেফাক
13 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

উচ্চশিক্ষায় নৈরাজ্য

গত শনিবার দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমাদের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলিতে শিক্ষার যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা হতাশাব্যঞ্জক। বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষায় যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে, রিপোর্টগুলিতে তাহারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে। অথচ এমন পরিস্থিতি কাহারো কাম্য হইতে পারে না।

প্রথম রিপোর্টটির ভিত্তি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবির একটি গবেষণামূলক প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২ শতাংশ শিক্ষক ও ৬৫ শতাংশ ছাত্রনেতা ক্লাস ফাঁকি দিতেছেন। শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার নানা কৌশলের মধ্যে রহিয়াছে দেরি করিয়া ক্লাসে আসা, সময় শেষ হওয়ার আগেই ব্যস্ততার কথা বলিয়া বাহির হইয়া যাওয়া, নির্ধারিত সংখ্যক ক্লাস না নেওয়া, নিয়মিত ক্লাস না নিয়া পরীক্ষার সময় ক্লাসে সাজেশন দেওয়া ও পরীক্ষায় আসিবে শুধু এমন বিষয় পড়াইয়াই ক্লাস শেষ করা প্রভৃতি। ইহাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, ডাক্তারদের ন্যায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কথাও প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাতে চরম আর্থিক অনিয়মের কথাও। প্রতিবেদনে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, এস্টেট অফিসের অনিয়ম, মিথ্যা পে-স্লিপ সরবরাহ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা আত্মসাৎ ও শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি তুলিয়া ধরা হইয়াছে। অন্যদিকে বলা হইয়াছে যে, দুই-চারটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে নিছক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। যাহার মূল উদ্দেশ্য অনেকটা এইরকম- 'ভর্তি হও, সার্টিফিকেট নাও'।

দ্বিতীয় রিপোর্টটির শিরোনাম 'মেডিকেল শিক্ষা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে'। কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, ইদানীং ঠিকমতো শিক্ষালাভ ছাড়াই ডিগ্রী অর্জন এবং অভিজ্ঞতা ছাড়াই অনেকে কিডনী প্রতিস্থাপন বিষয়ক অধ্যাপক, গাইনী অনকোলজিস্ট প্রভৃতি পদ অলংকৃত করিতেছেন। উল্লেখ্য, এক শ্রেণীর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় রাজধানীসহ যত্রতত্র বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহার সংখ্যা ৪০-এর উর্ধ্বে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের কোন মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বৎসর অযোগ্য ডাক্তারও পাস করিয়া বাহির হইতেছে। আমাদের চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে ইহার পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এমনকি যোগ্য ডাক্তারগণও ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

তৃতীয় খবরটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের '৫২ প্রথম শ্রেণী কেলেঙ্কারি' বিষয়ক। দীর্ঘদিন ধরিয়া ইহা আলোচিত হইতেছে। কিন্তু এখনো তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৩৮ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ৬৮ বৎসরে এত শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পায় নাই। স্বভাবতই এমএসএস পরীক্ষার ফলাফল লইয়া প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত নয়। ইহার অন্যতম কারণ বহুক্ষেত্রে শুধু দলীয় বিবেচনার ওপর ভিত্তি করিয়াই শিক্ষক নিয়োগ, বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান প্রভৃতি। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য গভীর জ্ঞানার্জন ও গবেষণা তাহা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হইতেছে। ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ফটোকপিকৃত হ্যান্ডনোটের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থারই ত্রুটি ও দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ।

আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় নানা অনিয়ম ও দুর্বলতা রহিয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানা কারণে শিক্ষার পরিবেশও নষ্ট হইয়াছে। বেশিরভাগ শিক্ষকই ভাল। কিন্তু তাহারা অসহায়। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই মেধাবী। কিন্তু তাহারা অবাঞ্ছিত পরিবেশের শিকার। সুতরাং উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়ম, দলবাজি, দলীয়করণ ইত্যাদি দূর করিতে পারিলে পুরো চিত্র পাল্টাইয়া দেওয়া সম্ভব। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পদগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা, মনন ও দক্ষতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে। লেখা-পড়ার সার্বিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনার জন্য ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের কিছু কিছু অংশ সংশোধন অত্যন্ত জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থের সঠিক ব্যবহারও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণার খাতে বরাদ্দ ব্যয় বৃদ্ধি করা উচিত। মাত্র ৮ শতাংশ দ্বারা এই উদ্দেশ্য পূরণ হইতে পারে না। সর্বোপরি উচ্চশিক্ষা যেন ডিগ্রীসর্বস্ব না হয় এবং ইহারও প্রধান উদ্দেশ্য হয় মানবিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, সেদিকে দৃষ্টিপাত করা একান্ত প্রয়োজন।